দশম অধ্যায়

ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন

বাঙালিরা কখনই বিদেশি ইংরেজ শাসকদের মেনে নেয়নি। ফলে, পলাশি যুদ্ধের পর পরই এদেশের কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পরাধীনতার একশ বছর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করে এদেশের সৈনিকরা ও দেশীয় রাজরাজারা। পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ। বাঙালি তরুণ সমাজ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দলে দলে আত্মাহুতি দিয়ে কাঁপিয়ে তোলে ইংরেজ শাসনের ভিত। উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে সবচেয়ে গৌরবময় ভূমিকা ছিল বাঙালিদের। এই অধ্যায়ে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামসহ পরবর্তী আন্দোলনসমূহে বাঙালি তথা তৎকালীন ভারতবাসীর গৌরবের ও আত্মত্যাগের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং এর ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারব;
- বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হব;
- সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ে উদ্বুদ্ধ হব।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

পলাশি যুদ্ধের একশ বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহিদের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ–এসবই এই সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। নিম্নে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

রাজনৈতিক : পলাশি যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য বিস্তার, একের পর এক দেশীয় রাজ্যগুলো দখল, দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীতি, অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। তাছাড়া অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। এসব ঘটনায় দেশীয় রাজন্যবর্গ অতন্ত ক্ষুব্ধ হন।

অর্থনৈতিক : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চরম অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা। কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগেই এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছিল। ক্ষমতা দখলের পর ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। আইন প্রয়োগের ফলে অনেক বনেদি জমিদার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

দরিদ্র কৃষকের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়। জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীদের তীব্র শোষণের শিকার এসব কৃষক মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

একদিকে বাজার দখলের নামে স্থানীয় শিল্প ধ্বংস, অপর দিকে অতিরিক্ত অর্থ লাভের আশায় জমি বন্দোবস্তের নামে কৃষি ধ্বংস হয়। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এ অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষ কোম্পানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

সামাজিক ও ধর্মীয় ঃ উপমহাদেশের জনগণের ক্ষোভের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সামাজিক ও ধর্মীয়। আঠারো শতকের শেষ ভাগে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্যের প্রভাব, কোম্পানির সমাজ সংস্কার জনকল্যাণমূলক হলেও গোটা রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলমান এসব মেনে নিতে পারেনি। ইংরেজি শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের ধর্ম প্রচার ইত্যাদির ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের গোঁড়াপন্থীরা শঙ্কিত হয়ে উঠে। ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি বিভিন্নভাবে সংস্কারের কারণে ক্ষুব্ধ হয় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

সামরিক সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে পদবি এবং বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তার উপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে উভয়ই ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ বিদ্রোহের আগুন প্রথমে জ্বলে উঠে পশ্চিম বঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ সালের ২৯এ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গলপাণ্ডে নামে এক সিপাহি। দ্রুত এই বিদ্রোহ মিরাট, কানপুর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এই বিদ্রোহে শামিল হয়।

কাজ বাংলাদেশের কোথায় কোথায় এ সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল– বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে সে অঞ্চলগুলো দেখাও।

বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের বাদশা বলে ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোদ্ধার বেগম হজরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লাহসহ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গ। বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সিপাহি ও যুদ্ধরত বিদ্রোহী নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হন। এই সংগ্রামে জড়িত অধিকাংশ হয় যুদ্ধে শহিদ হন অথবা তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

বাহাদুর শাহ পার্ক

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (মায়ানমার) নির্বাসিত করা হয়। রানি লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে নিহত হন। নানা সাহেব পরাজিত হয়ে অন্তর্ধান করেন। সাধারণ সৈনিক বিদ্রোহীদের উপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক সৈনিকের লাশ। এ ধরনের বীভৎস ঘটনা ঘটিয়ে শাসকগোষ্ঠী জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে। ফলে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৮৫৮ সালের জুলাইয়ের মধ্যে সব আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। তবে এর প্রভাব ছিল সুদুরপ্রসারী।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব ঃ এই বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক গুরুত্বও ছিল। এর ফলে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়। তাছাড়া এই ঘোষণাপত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। এই বিদ্রোহের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব হচ্ছে এই বিদ্রোহের ক্ষোভ থেমে যায়নি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ সচেতন হয়ে উঠে এবং আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

কাজ কোন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশে সিপাহিরা বিদ্রোহ করে, সে কারণগুলো চিহ্নিত কর।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ -১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ)

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদয়ের সম্প্রীতি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। একে অপরকে শত্রু ভাবতে শুরু করে। উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। নেতাদের উদার প্রচেষ্টা, যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচির ফলে মাঝে মাঝে ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিভেদ নীতিরই জয় হয়। উভয় সম্প্রদয়ের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতার অবসান ঘটে। পরিণতিতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশ ভাগ হয়।

বঙ্গভঙ্গ পটভূমি ঃ ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এই বিভক্তি ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। ভাগ হবার পূর্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। বঙ্গভঙ্গের এই পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন অনেক বড় হওয়ার কারণে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারি মহলে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯০৪ সালে ভারত সচিব এটি অনুমোদন করেন এবং ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। এই বছর অক্টোবরে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ। প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কলকাতা।

বঙ্গভঙ্গের কারণ ঃ বঙ্গভঙ্গের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল, যা নিচে উল্লেখ করা হলো-

প্রশাসনিক কারণ : লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। উপমহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সিতে। কলকাতা থেকে পূর্বাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল কঠিন কাজ। যে কারণে লর্ড কার্জন এত বড় অঞ্চলকে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে রাখা যুক্তিসংগত মনে করেন নি। তাই ১৯০৩ সালে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯০৫ সালে তা কার্যকর হয়।

আর্থ-সামাজিক কারণ ঃ বাংলা ভাগের পেছনে আরো কারণ ছিল যার একটি অর্থনৈতিক, অপরটি সামাজিক। তখন কলকাতা হয়ে উঠেছিল আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। শিল্প, কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতাকে ঘিরে। যা কিছু উন্নতি অগ্রগতি, সবই ছিল কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে, পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যাহত হয়। অথচ এখান থেকে যে কাঁচামাল সরবরাহ করা হতো তার জন্যও সুষ্ঠু যোগাযোগব্যবস্থা ছিল না। ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হতে থাকে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারায় এ অঞ্চলের লোকজন অশিক্ষিত থেকে যায়। কর্মহীনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। এ অবস্থার কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন ছিল।

রাজনৈতিক কারণ ঃ লর্ড কার্জন শুধু শাসন-সুবিধার জন্য বা পূর্ব বাংলার জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গ করেন নি। এর পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কংগ্রেস নেতারা কলকাতা থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। সুতরাং কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তি, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল বৃটিশ প্রশাসনের জন্য বিপদজনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হলো, অপরদিকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবেই কার্জন 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে যতটা না পূর্ব বাংলার কল্যাণে, তার চেয়ে বেশি ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলা ভাগ করেন। এভাবে কৌশলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করার ব্যবস্থা করা হলো।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ঃ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলোও বঙ্গ বিভাগে সন্তোষ প্রকাশ করে। নতুন প্রদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাবে এ আশায় তারা বঙ্গভঙ্গের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করে।

অপরদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এর পেছনের কারণ সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন উঁচুতলার মানুষ অর্থাৎ পুঁজিপতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, জমিদার, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক, রাজনীতিবিদদের স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে এরা বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। তবে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার কারণে হোক বা জাতীয় ঐক্যের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হোক, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। এই আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলকসহ গোখলের মতো উদারপন্থী নেতাও অংশ নেন। সুখেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গভঙ্গকে জাতীয় দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। চরমপন্থী নেতাদের কারণে এই আন্দোলনের সঙ্গে সশস্ত্র কার্যকলাপও যুক্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে। রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে ১৯১১ সালে দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় খুশি হয়, আর কংগ্রেস মনে করে এটি তাদের নীতির জয়। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ রদে প্রচণ্ড মর্মাহত হয়। ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ একে ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার জঘন্য উদাহরণ বলে মন্তব্য করেন।

বঙ্গভঙ্গের পর থেকে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল ধরে। এরপর থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হলে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক পথ আলাদা হয়ে যায়। মুসলমানদের জন্য ক্রমশ স্বতন্ত্র জাতি-চিন্তা তীব্র হতে থাকে।

একক কাজ ঃ বঙ্গভঙ্গের পিছনে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চিহ্নিত কর।

স্বদেশি আন্দোলন

ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, তাকেই স্বদেশি আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল দুইটি– বয়কট ও স্বদেশি।

'বয়কট' আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। ক্রমে ক্রমে 'বয়কট' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। বয়কট শুধু বিলেতি পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বিলেতি শিক্ষা বর্জনও কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। ফলে স্বদেশি আন্দোলন শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে রূপ নেয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন করার অপরাধে সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বহু শিক্ষার্থীকে বের করে দেওয়া হয়, যে কারণে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কয়েকটি কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রও গড়ে উঠে।

স্বদেশি আন্দোলন ক্রমশ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিলেতি শিক্ষা বর্জনের মতো পণ্য বর্জনের জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। স্থানে স্থানে সমিতির মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারে শপথ নেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলা এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকেন। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যেতে থাকে। একই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময় দেশি তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়ার দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে উঠে।

স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ যুক্ত হতে থাকে। আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন বাড়ানোর জন্য বাংলার জেলায় জেলায় বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেমন- ঢাকায় অনুশীলন, কলকাতায় যুগান্তর সমিতি, বরিশালে স্বদেশি বান্ধব, ফরিদপুর ব্রতী, ময়মনসিংহে সাধনা ইত্যাদি সংগঠনের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো। জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবি-সাহিত্যিকরা দেশাত্মবোধক বিভিন্ন রচনা পত্রিকায় লিখতে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেন প্রমুখ। বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে আন্দোলনের পক্ষে মানুষের মনে দেশপ্রেম জাগাতেও সক্ষম হন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে বেঙ্গলি, সঞ্জীবনী, যুগান্তর, অমৃতবাজার, সন্ধ্যা হিতবাদীসহ বাংলা-ইংরেজি পত্রিকা স্বদেশ প্রেম ও বাঙালি জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ লেখা ছাপতে থাকে। বাংলার নারীসমাজ স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ নিতে শুরু করে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী হলেও কিছু মুসলমান নেতা প্রাথমিক পর্যায়ে সমর্থন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে যোগ দেন নি। তাছাড়া স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দুধর্মের আদর্শ-আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব থাকার কারণে মুসলমান সমাজ এ থেকে দূরে থাকে। স্বদেশি আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থক ছিল বাংলার জমিদার শ্রেণি। কারণ বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ছিল মুসলমান। তারা ভূমিব্যবস্থার কারণে চরমভাবে শোষিত হচ্ছিল। অত্যাচারিত হচ্ছিল জমিদার ও তাদের নায়েব-গোমস্তাদের দ্বারা। যে কারণে জমিদারদের প্রতি কৃষকরা ক্ষুব্ধ ছিল। আবার এই জমিদারদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ট অনেক দরিদ্র হিন্দু কৃষকও বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিল।

দলীয় কাজ ঃ যেসব পত্রপত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিল, সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর। স্বদেশি আন্দোলনের ফলে গড়ে উঠা বিপ্লবী সমিতিগুলোর নামের পাশে অঞ্চলের নাম সাজাও।

মুসলমান সমাজ দূরে থাকার কারণে স্বদেশি আন্দোলন জাতীয় রূপলাভে ব্যর্থ হয়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বিলেতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনও সফল হয়নি। কারণ কলকাতার মাড়ওয়ারি অবাঙালি ব্যবসায়ী এবং বাংলার গ্রামগঞ্জের ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। সর্বোপরি গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলে এ আন্দোলন থেকে জনগণ দূরে সরে যায়। ফলে গণবিচ্ছিন্ন আন্দোলন সফলতার দ্বারে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়।

মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারেনি। সাধারণ মানুষ, এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়, দরিদ্র সমাজও এই আন্দোলনের মর্ম বোঝার চেষ্টা করেনি। ফলে আন্দোলন সর্বজনীন এবং জাতীয় রূপ লাভ করতে ব্যর্থ হয়। এর উপর চলে ইংরেজ সরকারের চরম দমননীতি, পুলিশি অত্যাচার। সবকিছু মিলে শেষ পর্যন্ত আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

স্বদেশি আন্দোলনে তাৎক্ষণিক সফলতা না এলেও এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণসচেতনতার জন্ম হয়। এ আন্দোলন উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে। আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রসমাজ যুক্ত হওয়ার কারণে গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই জনগণ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে।

ভারতের পরবর্তী আন্দোলনগুলোতে তাদের উপস্থিতির শুরু এখান থেকেই। এই আন্দোলনের আরেকটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এর ফলে দেশি শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা স্থাপনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এদেশীয় ধনী ব্যক্তিরা কল-কারখানা স্থাপন করতে থাকেন। যেমন: স্বদেশি তাঁত বস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি, কাগজ, চামড়াজাত দ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন স্থানে কল-কারখানা স্থাপিত হয়। ঐ সময় আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেমন বেঙ্গল ক্যামিকেল প্রতিষ্ঠিত হয়, বিখ্যাত টাটা কোম্পানি ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে কারখানা স্থাপন করে। তাছাড়া আরো ছোটখাটো দেশি শিল্প কারখানা এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বিজ্ঞান, শিক্ষা, ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার প্রতি আগ্রহ উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত, মুকন্দ দাসের বাঙালি জাতি চেতনায় সমৃদ্ধ এবং দেশাত্মবোধক গানগুলো ঐ সময় রচিত। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় রচনা করেন যা আমাদের জাতীয় সংগীত।

স্বদেশি আন্দোলনের হতাশার দিক হচ্ছে, এই আন্দোলনের কারণে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরে। নানা ঘটনার মাধ্যমে এই তিক্ততা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত, স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে তা আরো তিক্ত হয়। ফলে সম্পর্কের এই ভাঙ্গন এদেশের রাজনীতি, সমাজ ও জাতীয় কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে থাকে, যা শেষ হয় ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে।

একক কাজ ঃ স্বদেশি আন্দোলনের ফলে যেসব দেশীয় শিল্প স্থাপিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ঃ হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আন্দোলন দুটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয়ভিত্তিক গণ-আন্দোলন। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন গড়ে তোলে। অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন।

খিলাফত আন্দোলনের কারণ ঃ ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় বিব্রত হন। কারণ ধর্মীয় কারণে তারা খলিফার অনুগত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থাকতে বাধ্য। নিজ দেশের সরকার হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন দিয়েছে। তবে শর্ত ছিল যে এই সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু, যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধ শেষে জার্মানির পক্ষে যোগদানের জন্য ১৯২০ সালে সেভার্সের চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিস্বরূপ তুরস্ককে খণ্ডবিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা করা হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানরা মর্মাহত হয় এবং ভারতীয় মুসলমানরা খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে, যা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন দুই ভাই মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী।

বাংলায় খিলাফত আন্দোলন ঃ খিলাফত কমিটি গঠনের জন্য ১৯১৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ঢাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটি গঠনসহ খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর মুক্তি দাবি করা হয়। অমৃতসরের খিলাফত কমিটি কর্তৃক আহূত নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির অধিবেশনে ৬ জন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯২০ সালে খিলাফত 'ইসতেহার' প্রকাশ করা হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। বাংলার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয়। খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় আসেন। ঢাকার জনগণ তাদের 'আল্লাহু আকবার' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়। তাছাড়া ১৯এ মার্চ হরতালের দিন মুসলমান সম্প্রদায় রোজা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন উপোস থাকে। এদিন ঢাকায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্তে বলা হয় যে খিলাফত অক্ষুণ্ন না থাকলে মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকা অসম্ভব। এ বছর ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড স্মরণে এক সভা হয়। পাশাপাশি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচিও পালিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন ঃ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের পেছনে বিভিন্ন কারণ ছিল। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নতুন ধারার জন্ম দেয়। ১৯১৯ সালে সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই আইনে যেকোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এই আইন ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নরকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য কংগ্রেস বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। সরকারের দমননীতির পাশাপাশি চলে সংবাদপত্রে হস্তক্ষেপ। তাছাড়া মহাযুদ্ধের সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২১-২২ খ্রিষ্টাব্দে এই আন্দোলন সর্ব-ভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ঃ

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানরা যেমন প্রথমবারের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়, তেমন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামে। কিছুদিনের জন্য হলেও ব্রিটিশ বিভেদ ও শাসননীতি ব্যর্থ হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির এক রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি হয়। অপর দিকে এই ঐক্য ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। এই আন্দোলন শুধু শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের নয়, সারা ভারতের জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তবে এই আন্দোলন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দুই-ই ছিল ক্ষণস্থায়ী। আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন (১৯১১ - ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

স্বদেশি আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে, তাকেই বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অতর্কিত বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত্যা, গেরিলা পদ্ধতিতে খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসতে থাকে।

১৯১১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই সংগ্রাম জোরদার হলেও এর আগেই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। ১৯০৮ সালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরামের বোমা হামলার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। এই আন্দোলন মূলত শেষ হয় ১৯৩০ সালে। তবে এর পরেও বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা ঘটে।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের আগেই বাংলার প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। প্রথম পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ। পুলিন বিহারী দাস ছিলেন ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক। এরা বোমা তৈরি থেকে শুরু করে সব ধরনের অস্ত্র সংগ্রহসহ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সশস্ত্র আক্রমণ, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে এরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। অপরদিকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় নিয়োজিত প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন এবং ধরা পড়ার পর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এছাড়া মানিকতলা বোমা হামলাসহ নানা অভিযোগে বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে ঐ সময় ফাঁসি দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে কারাবন্দী ও দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয়। এই সমস্ত চরম দমননীতির কারণে প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লব স্থিমিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় ১৯১২ সালে। এই আন্দোলন কলকাতাকেন্দ্রিক হলেও ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও। এই সময় বিপ্লবীরা আবার হত্যা, বোমা হামলা, ডাকাতি ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় গোপনে বোমার কারখানা স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কলকাতা ও পূর্ব বাংলার যশোর, খুলনায় অনেক সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ১৯১২ সালের শেষের দিকে দিল্লিতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় লর্ড হার্ডিংকে হত্যার জন্য বোমা হামলা চালানো হয়। হার্ডিং বেঁচে যান। কিন্তু, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বাংলার অনেক বিপ্লবী বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহের মতো দুঃসাহসী চেষ্টাও করেছেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করা। এদের মধ্যে ছিলেন বাঘা যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপধ্যায়) ডা. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ শক্তির প্রতিপক্ষ জার্মানি থেকে অস্ত্র সাহায্যের আশ্বাস পান। তবে সরকার গোপনে এ খবর জানতে পেরে কৌশলে বাঘা যতীনসহ তার সঙ্গীদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করে। গ্রেফতারের সময় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে চিত্তপ্রিয় নামের, এক বিপ্লবী শহিদ হন। বাঘা যতীন তিন বিপ্লবীসহ আহত অবস্থায় বন্দী হন। বন্দী থাকাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। বন্দী অপর দুই বিপ্লবীর ফাঁসি হয়, আর একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, নির্মম অত্যাচারও বিপ্লবীদের পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরিরত দেশীয় এবং বিদেশি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হত্যার পরিকল্পনা অব্যাহত থাকে। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ, চোরাগুপ্তা হামলা, বোমাবাজি ক্রমাগত চলতে থাকে।

১৯১৬ সালের ৩০এ জানুয়ারি ভবানীপুরে হত্যা করা হয় পুলিশের ডেপুটি সুপার বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে। এভাবে হত্যা, খণ্ড যুদ্ধের সংখ্যা বেড়ে গেলে সরকার প্রতিরক্ষা আইনে বহু লোককে গ্রেফতার করে। ১৯২২ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার ও পুলিশি নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বৃদ্ধি পায় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড। বিপ্লবীরা অত্যাচারী পুলিশ সদস্যদের হত্যার আহ্বান জানিয়ে 'লালবাংলা' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করে। ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহা নামে একজন বিপ্লবী কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে অপর একজন ইংরেজকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য গোপীনাথকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আলিপুর জোনের সুপার বন্দী বিপ্লবীদের পরিদর্শন করতে গেলে প্রমোদ চৌধুরী নামে একজন বিপ্লবীর রডের আঘাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই অর্ডিন্যান্সের বলে অনেক বিপ্লবী কারারুদ্ধ হলে বিপ্লবী কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে শুরু করেন আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আবার বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য সে সময় বিপ্লবী আন্দোলন বাংলায় বেশি শক্তিশালী ছিল এবং বাঙালিরা ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। বাঙালি তরুণরা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে বারবার সশস্ত্র অন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সূর্যসেন

এমন একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, যাঁর আসল নাম সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪)। কলেজ জীবনে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এর মধ্যেই তিনি মাস্টারদা নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। এ সময় তিনি অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, নগেন সেনের সহায়তায় একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর সংগঠন এবং তিনি নিজে একের পর এক সশস্ত্র কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারবার গ্রেফতার হলেও প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই আত্মঘাতী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাঙ রিপাবলিকান আর্মি'। এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। 'স্বাধীন চিটাগাঙ সরকার' -এর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধ ছিল অসম শক্তির যুদ্ধ। সূর্য সেনের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার বিপুল বাহিনী নিয়োগ করে। চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় জালালাবাদ পাহাড়ে। গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে বিপ্লবীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। অনেক তরুণ বিপ্লবী এই খণ্ডযুদ্ধে এবং অন্যান্য অভিযানে নিহত হন। বিপ্লবীরা গ্রামের কৃষকদের বাড়িতে বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ সালে সংক্ষিপ্ত ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। চরম নির্যাতনের পর ১২ই জানুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দেওয়া এবং তাঁর মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাও ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা ১৯০০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডিসটিংশন নিয়ে বি.এ পাস করেন। ইতোমধ্যে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সূর্য সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সাহসী নারী প্রীতিলতাকে তাঁর যোগ্যতার জন্য চট্টগ্রাম 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তাঁর সঙ্গী বিপ্লবীদের নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। কিন্তু ধরা পড়ার আগে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। প্রীতিলতা বাংলার সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পাশাপাশি কলকাতায় যুগান্তর দলও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। ১৯৩০ সালে ডালহৌসি স্কোয়ারে চার্লস টেগার্টকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওই বছর ডিসেম্বরে এক অভিযানে নিহত হন কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন। এর আগে বিনয় বসুর হাতে নিহত হন অত্যাচারী পুলিশ অফিসার লোম্যা। এই বিপ্লবী অভিযানের সঙ্গে জড়িত বিনয় ও বাদল আত্মহত্যা করে এবং দীনেশের ফাঁসি হয়। ঐ বছরই বাংলার গভর্নর

জ্যাকসনকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত বীণা দাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মেদেনীপুরে পরপর তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়।

বিপ্লবীদের ব্যাপক তৎপরতা কমে গেলেও চট্টগ্রামে তারা এর পরও একের পর এক অভিযান চালিয়েছে। ১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের পল্টন ময়দানে ইংরেজদের ক্রিকেট খেলার আয়োজনে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে সক্ষম হয়। ঐদিনও দুইজন বিপ্লবী নিহত হন এবং দুইজন ধরা পড়লে তাদেরকে পরে হত্যা করা হয়।

সশস্ত্র আন্দোলন ব্যর্থতার কারণ

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হচ্ছে গণবিচ্ছিন্নতা। এই আন্দোলন পরিচালিত হতো গুপ্ত সমিতিগুলোর দ্বারা। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কিছু সংখ্যক শিক্ষিত সচেতন যুবক। নিরাপত্তার কারণে সমস্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড গোপনে পরিচালিত হতো। সাধারণ জনগণের এ সম্পর্কে ধারণা ছিলনা। সাধারণ মানুষের কাছে সশস্ত্র আক্রমণ, বোমাবাজি, হত্যাকাণ্ড সবই ছিল আতঙ্ক আর ভয়ের কারণ। ফলে সাধারণ মানুষ ছিল এদের কাছ থেকে অনেক দূরে।

বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলিম সম্প্রদায় এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিল। বিপ্লবীদের হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বাধ্যবাধকতা থাকায় অর্থাৎ গীতা স্পর্শ, কালীর সম্মুখে ধর্মীয় শ্লোক উচ্চারণ করে শপথ গ্রহণ, ইত্যাদির কারণে মুসলিম সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যুক্ত হওয়াকে বাধা বলে মনে করে।

গুপ্ত সংগঠনগুলোকে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হতো। সব দল সব বিষয়ে জানতে পারত না। ফলে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এ কারণে অনেক সময় সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কোনো অভিযান সফল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমন্বয়ের অভাবে সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা দেয়। তাছাড়া গুপ্ত সমিতিগুলো যার যার মতো করে কাজ করত। এক সমিতির সঙ্গে অন্য সমিতির কোনো যোগাযোগ ছিল না। ফলে সশস্ত্র বিপ্লবে কোনো একক নেতৃত্ব না থাকায় সারা দেশে আন্দোলন চলে বিচ্ছিন্নভাবে। এই বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া সরকারের কঠোর দমননীতি ও জনবিচ্ছিন্নতার কারণে বিপ্লবীরা নিরাশ্রয় এবং কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সংগঠন ও নেতাদের মধ্যকার আদর্শের বিরোধ-বৈরিতা যেমন সশস্ত্র বিপ্লবকে দুর্বল করেছিল, তেমন এদের মধ্যে তীব্র বিভেদের জন্ম দিয়েছিল। এ অবস্থায় বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হলে অনেক বিপ্লবী এতে যোগদান করেন।

সশস্ত্র বিপ্লব সফল না হলেও বিপ্লবীদের আত্মাহুতি, দেশপ্রেম, সাহস পরাধীন বাংলা তথা ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিল। এ আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে সফল না হলেও বিপ্লবীদের আদর্শ পরবর্তী আন্দোলনসমূহে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

একক কাজ ঃ ১. বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের নেতাদের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
২. 'প্রীতিলতার জীবন ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড'একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

স্বরাজ ও বেঙ্গল প্যাক্ট

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কংগ্রেসের অনেক নেতা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ সময় মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা চিত্তরঞ্জন দাস (সি.আর. দাস) ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। সি. আর. দাস ও তাঁর সমর্থকরা নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক

পরিষদগুলোতে যোগদানের পক্ষে ছিলেন। কারণ ঐ সময় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণে আইন অমান্য আন্দোলনের পরিবশে না থাকায় তাঁরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আইনসভায় যোগ দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯১৯ সালে সংস্কার আইন অচল করে দেওয়া। কিন্তু কংগ্রেসের গোয়া সম্মেলনে তাঁদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২২ সালে কংগ্রেসের একাংশের সমর্থনে সি.আর. দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয় স্বরাজ পার্টি। সি.আর. দাস হন এ দলের সভাপতি। মতিলাল নেহরু হন অন্যতম সম্পাদক।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যারা স্বরাজ লাভের জন্য স্বরাজ পার্টির সমর্থক ছিলেন, তাদেরকে পরিবর্তনপন্থী এবং যারা স্বরাজ পার্টির বিপক্ষে অংশ নেয় তাদের বলা হয় পরিবর্তনবিরোধী। এই দুই পক্ষের সঙ্গে শুধু আন্দোলনের পন্থা নির্ধারণের ধরন ছাড়া আর কোনো বিষয়ে বিরোধ ছিল না।

স্বরাজ দলের বিরোধীরা অসহযোগ আন্দোলনের ধারা বজায় রেখে আইন বয়কট করার সিদ্ধান্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। অপর দিকে স্বরাজ দল গঠনের পরপর বাংলার অনেক বিপ্লবী– সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক যুবনেতা এতে যোগদান করেন।

স্বরাজ দলের কর্মসূচি ঃ

১. আইনসভায় প্রবেশ করে সরকারি কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা এবং ১৯১৯ সালে প্রণীত সংস্কার আইন অকার্যকর করে দেওয়া;

২. সরকারি বাজেট প্রত্যাখ্যান করা এবং মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো;

৩. বিভিন্ন প্রস্তাব ও বিল উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও কর্মকাণ্ডকে জোরদার করা এবং

৪. বিদেশি শাসনকে অসম্ভব করে তোলা।

স্বরাজ দলের কার্যাবলি ঃ

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন অনুযায়ী, ১৯২৩ সালে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বরাজ দল তাদের কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। বিশেষ করে বাংলা ও মধ্য প্রদেশে স্বরাজ দল এ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানদের সমর্থন লাভের কারণে আইন সভায় স্বরাজ দলের ভিত শক্ত হয় এবং কর্মসূচি অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। বাংলায় স্বরাজ দলের অভূতপূর্ব বিজয়ের কৃতিত্ব ছিল দলের সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাসের। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা, উদারনীতি বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন তাঁকে এবং তাঁর দলকে শক্তিশালী করে তোলে।

বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি (ডিসেম্বর, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস। ফলে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সমস্যা দূর করার জন্য এই দূরদর্শী, বাস্তববাদী নেতা যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, ইতিহাসে তা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে খ্যাত। এই সময়ে বাংলার ইতিহাসে প্রধান ঘটনাই ছিল বেঙ্গল প্যাক্ট। নিঃসন্দেহে তাঁর এই প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

সি.আর. দাস ফর্মুলা নামে খ্যাত বাংলা চুক্তি সম্পাদনা করতে যেসব মুসলমান নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আব্দুল করিম, মুজিবুর রহমান, আকরম খান, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি। এ ছাড়া, স্যার আব্দুর রহিম, একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমঝোতা চুক্তি সম্পাদনে সহযোগিতা ও এতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। অপরদিকে বাংলার কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্র বসু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে বেঙ্গল প্যাক্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।

১৯২৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করার শর্তই ছিল মূল বিষয়। যেমনঃ

১. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে এ স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হবে।

২. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন পাবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শতকরা ৪০টি আসন পাবে।

৩. সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে।

৪. কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়ে আইন পাস করতে হলে আইনসভায় নির্বাচিত উক্ত সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে।

৫. মসজিদের সামনে গান-বাজনাসহ কোনো মিছিল করা যাবে না এবং গরু জবাই করার ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

একক কাজ ঃ বেঙ্গল প্যাক্টে অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে প্রতিফলন ঘটেছে তার ধারাগুলো পরপর সাজাও।

বেঙ্গল প্যাক্টের অবসান

বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের দলিল ছিল বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি। এই চুক্তির কারণেই মুসলমানের আস্থা অর্জন করে স্বরাজ পার্টি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয়। অপরদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতার ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন এবং মুসলমানরা কর্পোরেশনে চাকরি লাভে সক্ষম হয়। বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সি.আর দাসের এই পদক্ষেপ যেমন বাস্তবধর্মী ছিল তেমন ছিল প্রসংশনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে থাকতেই হিন্দু পত্রিকাগুলো, রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ, গান্ধীজির সমর্থক কংগ্রেস দল ও স্বরাজ দলবিরোধী হিন্দুরা 'বেঙ্গল প্যাক্ট'- এর তীব্র বিরোধিতা করে। অপরদিকে হিন্দু মহাসভার 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' নামক আন্দোলন এবং মুসলমানদের 'তাবলিগ' ও 'তানজিম' নামক আন্দোলন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে। ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দাসের অকালমৃত্যুতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া কংগ্রেস এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ 'বেঙ্গল প্যাক্ট-এর বিষয়ে উদাসীন থাকে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৬ সালে কলকাতা এবং পরে ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কারণে উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি নষ্ট হলে এই চুক্তি বাস্তবায়নের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

একক কাজ ঃ কার মৃত্যুতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ জন্য বন্ধ হয়ে যায়? এই ঐক্যের জন্য তার কাজের তালিকা প্রস্তুত কর।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

বেঙ্গল প্যাক্ট অকার্যকর হলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। ১৯২৮ সালে নেহরু রিপোর্টের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়, নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রশ্নে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা উত্থাপন করেন। এর মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রবল হতে থাকে এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত সাইমন কমিশনের রিপোর্ট সব রাজনৈতিক দল প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩০-১৯৩২ সাল পর্যন্ত লন্ডনে আহূত পরপর তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের দাবির বিষয়ে একমত হতে না পারার কারণে সমঝোতা ছাড়াই পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ প্রয়োগ করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড সমস্যা সমাধানের জন্য 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করেন। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ পৃথক নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে মুসলমানরা প্রতিবাদ সত্ত্বেও

সাম্প্রদায়িক রোয়োদাদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের বৈশিষ্ট্য সংবলিত ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। এই আইন ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলেও এই আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। কারণ জিন্নাহ এই আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। অপরদিকে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এই আইনে স্বায়ত্তশাসনের স্বাভাবিক অগ্রগতির কোনো লক্ষণ নেই। উভয় দলই ভারতের জন্য অধিকতর শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করে। অপরদিকে হিন্দু মহাসভা এই আইনের বিরোধিতা করে। দলগুলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে এই আইনের অধীনে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। অপরদিকে প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। এ অবস্থায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। তাছাড়া কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু নির্বাচন পরবর্তীকালে মন্তব্য করেন যে ভারতে দুইটি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষণীয়–একটি সরকার, অপরটি কংগ্রেস। তাঁর এ ধরনের মন্তব্য মুসলিম নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জিন্নাহ যিনি দীর্ঘ সময় ধরে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্যের কারণে রাজনীতির ভিন্ন পথে অগ্রসর হন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুতে প্রাদেশিক মুসলিমলীগের সভায় হিন্দু ও মুসলমান দুইটি ভিন্ন জাতি বলে উল্লেখ করেন। এভাবে লাহোর প্রস্তাবের আগেই হিন্দু-মুসলমান আলাদা জাতি; এই চিন্তা করার ফলে তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের চিন্তারও প্রকাশ ঘটতে থাকে। এই প্রকাশের বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব।

লাহোর প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাবের অনেক আগেই ১৯৩০ সালে কবি আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলো নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের রূপরেখা অঙ্কন করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে পর্যন্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের কথা ভাবেন নি। কিন্তু ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনের পরে বিজয়ী কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্যে তিনি বুঝতে পারেন যে, সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিন্দু নেতৃবৃন্দের শাসনাধীনে বাস্তব রূপ লাভ করবে না। সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং মুসলমানদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে জিন্নাহ তাঁর বহু আলোচিত-সমালোচিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঘোষণা দেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব মূলত তার এই ঘোষণার বাস্তব রূপ দেওয়ার পথনির্দেশ করে।

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় বলে এটি ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন এই অধিবেশনের সভাপতি। এ. কে. ফজলুল হক ২৩এ মার্চের অধিবেশনে তাঁর রচিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর হবে না, যদি এটি লাহোর প্রস্তাবে উত্থাপিত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

লাহোর প্রস্তাবের প্রধান ধারাসমূহ-

ক. ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভূ-ভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

খ. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

গ. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শ করে তাদের সব অধিকার এবং স্বার্থরক্ষার জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ. প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

উল্লেখিত প্রস্তাবের ধারাসমূহের কোথাও পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ নেই। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় এটিকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে প্রচার হতে থাকে। ফলে দ্রুত এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। যার ফলে বাঙালি মুসলমান পূর্বাংশ নিয়ে একটি 'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম লীগের দলীয় আইনসভার সদস্যদের এক কনভেনশনে নীতিবহির্ভূতভাবে জিন্নাহ 'লাহোর প্রস্তাব' সংশোধনের নামে ভিন্ন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নয়, ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে উত্থাপিত দিল্লি প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য এই যে লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন ধারার জন্ম হয়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের মাধ্যমে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকেন। সে অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরপর থেকে মুসলিম লীগ এবং জিন্নাহর রাজনীতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হতে থাকে; যার শেষ পরিণতি ছিল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের দেশ বিভাগ। দ্বি-জাতি তত্ত্বের বাস্তব পরিণতিতে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি (১৯৩৭-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)

১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু এবং ১৯২৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতিতে মওলানা আকরম খাঁ, তমিজউদ্দিন খান প্রমুখ মুসলিম নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

১৯২৯ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের পর 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলার কৃষকের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। ফলে কৃষক আন্দোলন ও রাজনীতিতে নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রজা সমিতির সম্মেলনে এ.কে. ফজলুল হক নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

পরবর্তী বছর এর নতুন নামকরণ হয় 'কৃষক-প্রজা পার্টি'। কৃষক প্রজা পার্টি ছিল সম্পূর্ণভাবে পৃথক এবং প্রদেশ পর্যায়ে গঠিত বাংলার রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯৩৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে। তবে কোনো দল এককভাবে সরকার গঠন করার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলে মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্মিলিত মন্ত্রিসভা ছিল দুর্বল। ফলে কৃষক-প্রজা পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ে।

জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের মতবিরোধের কারণে ১৯৪১ সালে ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ফজলুল হকের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন থাকায় ঐ সালের ডিসেম্বর মাসেই তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ নতুন মন্ত্রিসভা ছিল বহুদলের সমাবেশ। এরূপ একটি মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে ফজলুল হক বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা করেন। এই নতুন ধারা ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করা। ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত

ক্ষমতাসীন ছিল। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন না পেয়ে ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৪৩ সালের ১৩ই এপ্রিল দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সর্বনাশা এ দুর্ভিক্ষে বাংলার ৩০ লক্ষাধিক লোক মৃত্যুবরণ করে বলে ধারণা করা হয়। ১৯৪৫ সালে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলিম লীগ দুইটি উপদলে বিভক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৪ আসনে জয়লাভ করে। প্রকারান্তরে পাকিস্তান দাবির প্রতি বাংলার মুসলমানদের সুস্পষ্ট সমর্থনের প্রতিফলন ঘটায়।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এ নির্বাচন ও নির্বাচনের ফল ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৬ সালের ২৪এ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রকৃতপক্ষে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার সময় ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও দেশ বিভাগের রাজনৈতিক পরিবেশে কলকাতার দাঙ্গা ও স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও ভারত বিভাগ ছিল এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অখণ্ড বাংলার উদ্যোগ

১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূপ নেয়। এরকম চরম জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ঘোষণা করে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাস 'বসু'-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব নামে খ্যাত।

১৯৪৭ সালের ২৭এ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তব্যে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এর পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বসু তাঁর এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিক' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

বসু- সোহরাওয়ার্দী চুক্তি

১৯৪৭ সালের ২০এ মে তারিখে কলকাতায় কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর বাসগৃহে অখণ্ড বাংলার পক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন মুসলিম লীগের পক্ষে আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান, মোহাম্মাদ আলী, এ. এম মালেক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অপরদিকে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায় ও সত্যরঞ্জন বখসী। সভায় স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. বাংলা হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে এ রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে তা সে নিজেই ঠিক করবে।

২. হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসনসংখ্যা বণ্টন করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইন সভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩. স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হবে। পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। উক্ত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়া বাকি সদস্যপদ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে।

৪. সামরিক ও পুলিশ বাহিনীসহ সকল চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকবে। এসব চাকরিতে শুধু বাঙালিদের নিয়োগ দেয়া হবে।

৫. সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩০ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ থাকবে। এর মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন।

অখণ্ড বাংলা প্রস্তাবের ব্যর্থতা

অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ উভয় দলের নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে মুসলিম লীগের গোঁড়াপন্থী রক্ষণশীল নেতারা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহরও এই প্রস্তাবের প্রতি মৌন সমর্থন ছিল। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতাদের তীব্র বিরোধিতার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যায়। ফলে উভয় নেতা অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মত বদলে ফেলেন। মুসলিম লীগের রক্ষণশীল নেতারা প্রথম দিকে এর সমর্থক হলেও পরে তারা অখণ্ড বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ করার দাবি করতে থাকেন। বিশেষ করে খাজা নাজিমুদ্দিন, আকরম খাঁ প্রমুখ। আকরম খাঁ ১৬ই মে দিল্লিতে জিন্নাহর সঙ্গে এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের জানান যে অখণ্ড বাংলা মুসলিম লীগ সমর্থন করে না। ফলে বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব মুসলিম লীগের সমর্থন হারায়।

বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব অর্থাৎ বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব প্রথম থেকেই কংগ্রেসের উঁচু পর্যায়ের নেতাদের তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হয়। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু ও সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলসহ বহু নেতা এর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা কোনোমতেই স্বাধীন ভারতবর্ষে কলকাতাকে হাতছাড়া করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাছাড়া পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আসামও তাঁদের প্রয়োজন ছিল। অপরদিকে কংগ্রেস মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়েও শংকিত ছিলেন। হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ যুক্ত বাংলার চরম বিরোধী ছিলেন। ফলে যুক্ত বাংলা প্রস্তাব কংগ্রেসের সমর্থন হারায়।

তাছাড়া পত্রপত্রিকা যুক্ত বাংলার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালাতে থাকে। পশ্চিম বাংলাকেন্দ্রিক বাঙালি অবাঙালি, ব্যবসায়ী, বণিক, পুঁজিপতিশ্রেণি এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও যুক্ত বাংলার বিপক্ষে সোচ্চার ছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা ভাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অপরদিকে জুন মাসের ৩ তারিখে লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ভারত বিভক্তির ঘোষণায় বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের পরিকল্পনা করেন। জুন মাসের ২০ তারিখে বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দিলে বাংলা বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা বলা হয়। ১৯৪৭ -এর আইন অনুসারে ভারত ভাগ হয়। ১৪ই আগস্ট জন্ম নেয় পাকিস্তান নামে এক কৃত্রিম মুসলিম রাষ্ট্রের; আর ১৫ই আগস্ট জন্ম নেয় আরেকটি রাষ্ট্রের, যার নাম হয় ভারত। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়– পরবর্তীকালে যা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে, পশ্চিম বাংলা যুক্ত হয় ভারতের সঙ্গে। এভাবেই প্রস্তাবিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়।

একক কাজ ঃ যুক্ত বাংলার বিরোধীদের বিরোধিতার কারণ অনুসন্ধান কর।

বৃটিশ শাসন অবসান

ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয়

বৃটিশ শাসন অবসানের পূর্ব কথা : ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ক্রিপস মিশন প্রস্তাব সব মহল প্রত্যাখ্যান করলে সমগ্র ভারতব্যাপী তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। রাজনীতিতেও নেমে আসে চরম হতাশা। পৃথিবীব্যাপী চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ। জার্মানির মিত্র রাষ্ট্র জাপানের ভারত আক্রমণ আশঙ্কায় ভারতীয়দের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপস্থিতিকে এই আক্রমণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়লে জাপানের

ভারত আক্রমণ পরিকল্পনার পরিবর্তন হতে পারে। এই চিন্তা করে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তাঁর প্রেরিত প্রস্তাবে তিনি ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যেতে বলেন। শুরু হয় কংগ্রেসের ভারত ছাড় আন্দোলন। গান্ধীজির ডাকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমগ্রভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রবল ব্রিটিশবিরোধী রূপ নেয়। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী এক ঘোষণায় বলেন 'আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই। এমনকি এই রাত্রির মধ্যেই, উষালগ্নের আগেই যদি তা সম্ভব হয়।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করব। আর এ হবে আমাদের জীবনে শেষ লড়াই'।

কিন্তু ইংরেজ সরকার ঐ সময় কোনোভাবেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং সরকার এই আন্দোলন দমন করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ঐ দিনই মধ্যরাতে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ- গান্ধীজি, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরুসহ অনেকে গ্রেফতার হন। সরকার কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সব নেতা কারাবন্দী হন।

নেতৃবন্দের গ্রেফতারের খবরে অহিংস আন্দোলন সংহিস আন্দোলনে পরিণত হয়। নেতাদের মুক্তির দাবিতে সর্বত্র হরতাল, কলকারখানা, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হতে থাকে। উত্তেজিত জনতা স্থানে স্থানে রেললাইন উপড়ে ফেলা, চলন্ত ট্রেনে ইট পাটকেল নিক্ষেপ, রেল স্টেশনে, সরকারি ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো বেপরোয়া হয়ে উঠে। নেতৃত্বহীন আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সারা ভারতে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকে। কোথাও কোথাও অস্থায়ী সরকার, কোথাও বা জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তমলুক থানা দখল করার সময়। মাতঙ্গিনী হাজরা নামে এক বৃদ্ধা জাতীয় পতাকা হাতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

এই আন্দোলনের সময় ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে কৃত্রিম সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মানুষকে দিশেহারা করে তোলে। তাছাড়া দেশব্যাপী মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সব মিলিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে হতাশ জনগণের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব তীব্র হতে থাকে।

একক কাজ ঃ মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান কর।

যখন দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিতে চরম হতাশা বিরাজ করছে, ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজ তাড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা, তখন যুদ্ধ করে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য বাঙালিদের নেতৃত্বে দেশের বাইরে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ বা Indian National Army (INA)। এই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই বাহিনী গড়তে সাহায্য করেন আরেক বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ বসু কংগ্রেসে আপোষকামী রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন। প্রথম থেকেই স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতির প্রশ্নে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ছিল। কিশোর বয়স থেকে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন সুভাষ বসু ছিলেন গান্ধীর অহিংস নীতির বিরোধী। ১৯৩৭ সালে গান্ধীর অনুমোদনে কংগ্রেসের সভাপতি হলেও গান্ধীই আবার দ্বিতীয় দফায় তাঁকে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেননি। তিনি সুভাষ বসুকে এ পদে নির্বাচন করতে নিষেধ করেন। সুভাষ বসু এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেন এবং গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে আবার সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধীর প্রতি এই ধরনের চ্যালেঞ্জে জয়ী সুভাষ পরবর্তীতে কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধীর সহযোগিতা পেতে ব্যর্থ হন। হতাশ হয়ে সুভাষ বসু কংগ্রেস ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন। তাঁর রাজনীতি আপোষহীন পথে অগ্রসর হতে থাকে। সুভাষ বসুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভীত ইংরেজ সরকার বারবার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত কারামুক্তি লাভ করে ১৯৪১ সালে সবার অলক্ষে সুভাষ বসু দেশ ত্যাগ করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তিনি প্রথম ইংরেজদের শত্রু ভূমি জার্মানিতে গমন করেন। সেখানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেনাবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিবিদ, যিনি বিদেশি শক্তির সাহায্য নিয়ে লড়াই করে মাতৃভূমি স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় ডুবোজাহাজে করে এক দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তিনি জাপানে আসেন। সেখানে অবস্থানরত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সহযোগিতায় জাপানে বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দু ফৌজ। ১৯৪৩ সালে তিনি এই বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরই ভারতীয় ভূখণ্ডের আন্দামান

দ্বীপে গঠন করেন আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকার। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই সরকারের সেনাবাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। গড়ে তোলেন আজাদ হিন্দু ফৌজ এবং সুভাষ বসু তখন ছিলেন ইংরেজদের কাছে আতঙ্ক। সুভাষ বসু কর্তৃক সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতে ইংরেজ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এই দুঃসাহসী বাঙালির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪ সালে বার্মা হয়ে ভারত ভূমিতে পদার্পণ করে। কোহিমা-ইম্ফলের রণাঙ্গনে বীরত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে আজাদ হিন্দু ফৌজ এসব অঞ্চল দখল করে নেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণাঙ্গনে জাপানি বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর তীব্র আক্রমণ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটলে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পিছু হটতে হয়। ১৯৪৫ সালে জাপানের রেঙ্গুন ত্যাগের কারণে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। ব্যর্থ হয় এক দুঃসাহসী বাঙালি দেশপ্রেমিকের লড়াই করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রচেষ্টা। নেতাজি সুভাষ বসু সফল হলে ভিন্নভাবে লিখতে হতো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। তখনি রচিত হতো বাঙালির দেশপ্রেম আর বীরত্বের আরেক গৌরবের ইতিহাস।

সুভাষ বসু প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ সরকার ছিল অসাম্প্রদায়িক। এই সরকার ও সেনাবাহিনীতে অনেক যোগ্য মুসলমান অফিসার ও সেনাসদস্য ছিলেন। তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপ্রধান শাহনাওয়াজ ছিলেন মুসলমান। এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ প্রগতিশীল বাঙালি নেতা নেতাজি সুভাষ বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাঁর অন্তর্ধান সম্পর্কে নানা কাহিনি প্রচলিত থাকলেও প্রকৃত সত্য এখনও গবেষণার বিষয়। ব্যর্থ হলেও নেতাজির অভিযান ভারতীয় স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সঞ্চার করেছিল। তিনি ব্রিটিশ-ভারতে দেশীয় সেনাসদস্যদের মধ্যে আনুগত্যের ফাটল ধরাতে যেমন সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি তাদের বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন।

দলীয় কাজ ঃ দেশ স্বাধীনের জন্য নেতাজিকে কোন কোন দেশে যেতে হয় ধারাবাহিকভাবে তার তালিকা তৈরি কর।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতার পর ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব আলামত প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয়দের আয়ত্তে রাখা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ব্রিটিশ সরকার একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে। ইতোপূর্বে যুদ্ধ চলাকালীন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সিমলায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল এক পরিকল্পনা পেশ করেন, যা 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের সাম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধির সংখ্যা নিয়ে তীব্র মতবিরোধের কারণে 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করে। এই পরিবর্তনের ধারা ভারতের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে। শ্রমিক দল ভারতের স্বাধীনতা দানের এবং ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইংল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৬ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে নেতৃত্বে দ্বন্দ্বের ফলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ দুইটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন অবাঙালি ব্যবসায়ী ও রক্ষণশীলদের নেতা। অপরদিকে আবুল হাশিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রগতিশীল বাঙালিদের নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দীই বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে মুসলমান তরুণ ছাত্রসমাজ মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রধান নির্বাচনী কর্মসূচি করে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক আইন সভায় অভুতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচন এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুস্পষ্ট রায় ঘোষিত হয় এবং মুসলিম লীগ নিজেকে বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র দল হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য এই নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তান মুসলিম লীগ গরিষ্ঠ ভোট পায়নি। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের ভোটে পাকিস্তান প্রস্তাব জয়ী হয়েছিল। এই জয়ের পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

নির্বাচন-উত্তর উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভিন্ন পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিচক্ষণ অ্যাটলি সরকার বুঝতে পারেন যে সম্মানজনকভাবে খুব বেশি দিন ব্রিটেনের পক্ষে ভারত শাসন করা সম্ভব হবে না। ফলে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্সের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভারতে আসে। যাকে বলা হয় ক্যাবিনেট মিশন। এ সময় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কনভেনশন পাকিস্তান দাবি মেনে নিয়ে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রতি আহ্বান জানায়। ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মে মাসে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে।

মন্ত্রীমিশন বা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিন স্তরবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিষয় উল্লেখ করা হয়। যথা-

ক. কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা।

খ. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠন করা।

গ. হিন্দুপ্রধান গ্রুপ, মুসলমানপ্রধান গ্রুপ এবং বাংলা ও আসাম গ্রুপ- এ তিন ভাগে প্রদেশগুলোকে ভাগ করা এবং প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা। তবে শর্ত দেওয়া হয় যে এ, পরিকল্পনা গ্রহণ সার্বিকভাবে করতে হবে। এর অংশবিশেষ গ্রহণ করা যাবে না।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য হলেও মুসলিম লীগ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে। কারণ মুসলিম লীগ মনে করে এই পরিকল্পনার মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত আছে। কংগ্রেস এ পরিকল্পনায় এককেন্দ্রিক সরকারের অখণ্ড ভারত গঠনের প্রতিফলন দেখতে পায়। কংগ্রেস নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রস্তাবটি গ্রহণে রাজি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে মুসলিম লীগও তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো অকেজো হয়ে যায়।

বড়লাট ওয়েভেল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দলকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের আহ্বান জানান। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি জহরলাল নেহেরু কর্তৃক মুসলিম লীগের স্বার্থবিরোধী বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদানের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে। কিন্তু বড়লাটের আহ্বানে নেহেরু সরকার গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করে। এই দিন ভয়াবহ দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের পূর্বে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব পালনের জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট হিসেবে পাঠানো হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে দেশরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ দেশবিভাগে সম্মত হতে বাধ্য হন। ৩রা জুন মাউন্টব্যাটন ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি এও ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। অপরদিকে পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়ায় মুসলিম লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই লন্ডনে কমন্স সভার এক ঘোষণায় ভারত-পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। দুই দেশের সীমানা নির্ধারণের জন্য স্যার র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে সীমানা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। ৯ই আগস্ট র‍্যাডক্লিফ তাঁর সীমান্ত রোয়েদাদ সমাপ্ত করে ভাইসরয়ের কাছে জমা দেন, যা রহস্যজনক কারণে আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করা হয়, যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগষ্ট ভারত নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

দলীয় কাজ ঃ 'ভারত স্বাধীনতা আইন'-এর মাধ্যমে কেন দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়- এর যৌক্তিকতা উপস্থাপন কর।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাগ করেন কে?

ক. লর্ড কর্ণওয়ালিস খ. লর্ড কার্জন

গ. লর্ড চেমসফোর্ড ঘ. লর্ড রীডিং

২. মাস্টারদা সূর্য সেন এর নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল-

i. চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী গঠন

ii. স্বাধীন চিটাগাঙ সরকার এর ঘোষণা

iii. চিটাগাঙ রিপাবলিকান আর্মি গঠন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

নিশাপুর চা বাগানে চা-শ্রমিকরা তাদের কম মজুরির প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছিল। অবরোধ ভাঙচুর চালাতে থাকলে শ্রমিক নেতা কিরণ তাদের সহিংস আন্দোলন পরিত্যাগ করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানান।

৩. শ্রমিক নেতা কিরণ কোন ব্যক্তির নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন?

ক. ক্ষুদিরাম খ. মাস্টারদা সূর্যসেন

গ. মহাত্মা গান্ধী ঘ. পুলিন বিহারী দাস

৪. উক্ত নেতার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল-

i. হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য দৃঢ়করণ

ii. নির্যাতনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

iii. সত্যাগ্রহ বন্দীদের মুক্তিদানের দাবি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. সালেহপুর ইউনিয়নটি নদীর তীরে অবস্থিত। গত বছর বন্যায় ফসল ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আয়তনে বড় হওয়ায় ত্রাণ তৎপরতাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে এই ইউনিয়নকে দুইটি আলাদা ইউনিটে ভাগ করা হয়।

ক. মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসিত করা হয়?

খ. স্বত্ব বিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বঙ্গভঙ্গের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত কারণটিই কী বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ মনে কর? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. কেয়া ও কণা দুই বোন ঈদের কেনাকাটা করতে বাজারে যায়। কেয়া তার পছন্দের তালিকায় বিদেশি পণ্য রাখলেও কণা বিদেশি পণ্যকে পরিত্যাগ করে দেশি পণ্য কেনার পক্ষে মত দেয়। অবশেষে কণা তার বোন কেয়াকে দেশি পণ্য কেনার বিষয়টি বুঝাতে সক্ষম হয় এবং উভয়ে দেশি পণ্য ক্রয় করে বাসায় ফেরে।

ক. দিল্লির মুঘল সম্রাটের পদ বিলুপ্ত করেন কে?

খ. 'এনফিল্ড' রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলল কেন?

গ. কোন আন্দোলনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কণা দেশি পণ্য কিনতে উৎসাহবোধ করেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর কেয়ার মতো মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়? যুক্তি দাও।